রাতভোর নাট্য কোজাগরী

বিশ্বনাট্যদিবস ২৭ মার্চ ২০১৩, বুধবার, নদিয়ার শান্তিপুরে (বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী রঙ্গমঞ্চ শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি হল)

আয়োজন শান্তিপুর সাংস্কৃতিক, যোগাযোগ ৯৬৩৫৭৫৬২৬৬, ৯৪৩৪২১৮৮১৯

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 18 16 March 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা ১৬ মার্চ ২০১৩ শনিবার ২ টাকা

• বাংলাদেশ আপডেট পৃ ২ • বাংলার মুখ পৃ ২ • চূর্ণী দূষণ পৃ ৩ • লাইব্রেরি পৃ ৩ • আম চাষ পৃ ৩ • কুডানকুলাম থেকে ফিরে পৃ ৪ • রামলীলা পৃ ৪

বেনাপোল সীমান্তে গিয়ে প্রজন্ম চত্বরের গণবিদ্রোহে সহমর্মিতা

৩ মার্চ, জিতেন নন্দী, বনগাঁ •

আজ আমরা সকাল দশটা পাঁচের বনগাঁ লোকালে শিয়ালদা থেকে যাত্রা শুরু করি। আমাদের মন্থন পত্রিকার বন্ধুরা ছাড়াও ছিলেন সোনারপুরের 'লেখক শিল্পী ঐক্যমঞ্চ'–এর শম্ভুনাথ মণ্ডল ও মৃন্ময় চক্রবর্তী, একক মাত্রা পত্রিকার সৌমিত্র, তবু বাংলার মুখ পত্রিকার সুভাষ দাস। এছাড়া উল্টোডাঙা, দমদম এবং মাঝের বিভিন্ন স্টেশন থেকে অন্য বন্ধুরাও ট্রেনে ওঠেন। আমাদের সকলের গন্তব্য ছিল বনগাঁ।

দুপুর বারোটা নাগাদ আমরা বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছাই। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি আরও অনেকে এসে জড়ো হয়েছে। 'বনগাঁ নাট্যচর্চা কেন্দ্র'–র শিল্পীরা ইতিমধ্যেই গান শুরু করে দিয়েছিলেন। আমরা সকলে জড়ো হচ্ছি। দেখি সামনে একটা ছোট্ট মিছিল এল। সামনে ব্যানার 'বনগাঁ জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদ', প্রত্যেকের হাতে একটা করে জাতীয় পতাকা। সে কী! এরা কি তবে রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের জন্য অভিনন্দন জানাতে সীমান্তে যাচ্ছে? না, জানা গেল, এরাও সীমান্তে যাবে শাহবাগের আন্দোলনকে সংহতি জ্ঞাপন করতে। যাই হোক ওরা একটা ম্যাটাডোরে মাইক নিয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে এগিয়ে গেল। আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমান্ত অভিমুখে পা বাড়ালাম। অল্প দূরত্ব যাওয়ার পরই চাকদা মোড় থেকে শান্তিপুরের রঙ্গপীঠ নাট্য সংস্থার বন্ধুরা একটা মাথা ঢাকা ট্রাকে করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হল।

বিশাল কোনো মিছিল নয়। কিন্তু আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে একদল মানুষ চলেছে বেনাপোল সীমান্তে। সামনে বনগাঁর ওই শিল্পী বন্ধুরা গিটার আর ডুগডুগি বাজিয়ে নেচে নেচে গাইতে গাইতে চলেছে। ওদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছে 'আমরা' গোষ্ঠীর বাবলা আর কয়েকজন যুবক, যারা এসেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগ্রাম থেকে। নৈহাটি থেকে আগত 'পরিপ্রশ্ন' পত্রিকার বন্ধুরা হাঁটছিল। তারই পিছনে হেতুবাদী পত্রিকার ব্যানার নিয়ে কয়েকজন এবং ব্যানারহীন বেশ কিছু মানুষ। শেষে ট্রাকে শান্তিপুরের রঙ্গপীঠের শিল্পীরা কবিতা ও গান পরিবেশন করে চলেছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর অবশ্য সেই শিল্পীরাও রাস্তায় নেমেই গান গাইতে শুরু করলেন।

দীর্ঘ পথ, আন্দাজ প্রায় ৯–১০ কিলোমিটার। জনবহুল অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার পরও মাঝে মাঝে পথের মোড়ে জটলা, দূরে গ্রামের ঘর থেকে বউ, বাচ্চারা বেরিয়ে এসেছে। সকলেই বুঝতে চাইছে, কারা এরা, কোন পার্টি, কোথা থেকে এসেছে? প্রচলিত মিছিলের সারিবদ্ধ ঢঙটা নেই, একটু এলোমেলো। নিজেদের গানের উত্তেজনায় নিজেরাই মত্ত। এ কেমন মিছিল! বেশ কিছু যুবক ক্যামেরা আর মোবাইলে ছবি তুলে চলেছে, কেউ ভিডিও করছে। বিলি হচ্ছে ফোল্ডার 'জ্বেলে রাখো এই পবিত্র রাগ শাহবাগ শাহবাগ', 'আমাদের লোকালয়' এবং 'সংবাদমন্থন' পত্রিকার বাংলাদেশ বিষয়ক পত্রিকার কপি। প্রথমদিকে যখন শ্লোগান উঠল, 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি, বাঙালি', সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিল, কিন্তু যখন চেঁচিয়ে বলা হল, 'রাজাকারের ফাঁসি চাই', একটু সকলের ইতস্তত ভাব, একটা অস্বস্তি। তখন মাইকে এই পদযাত্রা এবং বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের আন্দোলনের সমর্থনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু স্থানীয় মানুষেরও রাজাকারদের প্রতি দারুণ ক্ষোভ! সেটা কিছু কিছু মন্তব্যে ভেসে আসছিল। আমাদের মেয়েরা একটা ভাতের হোটেলে খেতে ঢুকেছিল, সেখানেও সকলে সমস্বরে ফাঁসির আদেশকে সমর্থন জানালো। ফাঁসির মতো চরম শাস্তিদান নিয়ে পাল্টা যুক্তি অধিকাংশের মতদানে উড়ে গেল।

অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম বেনাপোলে। সীমান্তরক্ষীদের তৃতীয় ব্যারিকেডের আগে আমাদের রুখে দেওয়া হল। এদিকে আমরা শুনলাম, সকাল এগারোটা থেকে ওপারের আন্দোলনকারী বন্ধুরা জিরো পয়েন্টের ওধারে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কংগ্রেসিদের উদ্যোগে পাঁচজনের একটা দল সীমান্তরক্ষীদের এসির সঙ্গে কথা বলতে গেল। আমরা তো ওপারের ভাই–বোনেদের সঙ্গে মিলতে চাই, কথা বলতে চাই। কিন্তু

এর পর দুয়ের পাতায়

বোমার আঘাতে তিনজন পস্কো প্রতিরোধ কর্মী নিহত, জোর করে জমি অধিগ্রহণ চলছে

৯ মার্চ ২০১৩ একটি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের সমন্বয়ে তৈরি প্রতিনিধিদল ওড়িশার প্রস্তাবিত পস্কো ইস্পাত প্রকল্পের গ্রাম, জগৎসিংহপুর জেলার ঢিনকিয়া এবং গোবিন্দপুর যান। তাঁদের রিপোর্ট অনুসারে •

২ মার্চ সেখানে বোমার আঘাতে পস্কো প্রতিরোধ আন্দোলনের তিন কর্মী মারা যান এবং একজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই বোমা বিস্ফোরণের কিছু পরেই নতুন করে ফের জমি অধিগ্রহণের সূচনা করে ওড়িশা সরকার। ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছিল। শুরু থেকেই জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে আসা গ্রামবাসীদের সাথে প্রশাসন এবং পস্কো প্রকল্পের সমর্থকদের সংঘর্ষ হচ্ছিল। এর আগে আন্দোলনের মাধ্যমে বারবার এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল।

২ মার্চের বোমার আঘাতের ঘটনা বর্ণনা করে পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি এবং মৃতদের পরিবারবর্গ। নবীন মণ্ডল (৩০), নরহরি সাহু (৫২), মানস জেনা (৩২), ও লক্ষ্মণ প্রামাণিক (৪৬) পাশের পাটানা গ্রামের পানের বরজ থেকে বেরিয়ে এসে আড্ডা মারছিল। সেখানে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ হয় এবং প্রথমে তিনজন মারা যায় ও চতুর্থ ব্যক্তি মারাত্মকভাবে ঘায়েল হয়। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জগৎসিংহপুরের এসপি সত্যব্রত ভোই স্থানীয় ও জাতীয় মিডিয়াতে ঘোষণা করে, এরা নিজেরা বোমা বাঁধতে গিয়ে ফেটে মারা গেছে। মারাত্মক ঘায়েল হওয়া লক্ষ্মণ প্রামাণিক হাসপাতালে জানান, তাঁদের দিকে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল, পুলিশ মিথ্যে কথা বলছে। ঘটনার ১৫ ঘণ্টা পরে পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছানোর আগেই ৩ মার্চ সকালবেলা থেকে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মৃত দুইজনের বাড়ির লোকেরা জানায়, পুলিশ ৩ মার্চ মধ্যরাতে তাদের বাড়ি এসে একটি কাগজ দিয়ে বলে সই করে দিতে। ওই কাগজে লেখা ছিল, মৃতরা নিজেরা বোমা বাঁধতে গিয়ে মারা গেছে। যখন নরহরি সাহুর ছেলের বউ কুসুমবতি সাহু ৩ মার্চ সন্ধ্যেবেলা স্থানীয় অভয়চন্দ্রপুর থানায় এফআইআর করতে যান, তখন তাঁকে ফিরিয়ে দেয় থানা, বলে যে, নিজেরা বোম বাঁধতে গিয়ে মারা গিয়ে শেষে নিজেরাই এফআইআর করতে এসেছে। এই বিষয়ে প্রথম যে এফআইআরটি রুজু হয় অভয়চন্দ্রপুর থানায়, সেটি করা হয় ৪ মার্চ সকালে। সেটি করেন রঞ্জন বর্ধন এবং তা করা হয় তিনজন মৃত, আহত, অভয় সাহু, সুরেন্দ্র দাস, পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে।

নাগরিক প্রতিনিধিদলটির পর্যবেক্ষণ, ৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এলাকায় সংঘর্ষ ও হিংসা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। এই জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গোবিন্দপুর গ্রামের অন্তত ১০৫টি পানের বরজ ধ্বংস করা হয়েছে। ৭ মার্চ প্রকল্পবিরোধীদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জে ৪১ জন গ্রামবাসী আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। ভূমিহীন খেতমজুররা পানের বরজগুলির রোজগারের ওপরই বেঁচে থাকে। ওই এক একর জমির ওপর যে পানের বরজগুলি আছে, তার ওপর নির্ভরশীল ১৫০টি পরিবার। এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিহীনদের ক্ষতিপূরণের কোনো বন্দোবস্ত নেই।

প্রতিনিধিদল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। তাছাড়া গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া, ঢিনকিয়া পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং নিহত ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন মেহের ইঞ্জিনিয়ার, সুমিত চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন মহান্তি, প্রমোদিনী প্রধান, সরোজ মহান্তি, পার্থ রায় প্রমুখ।

ফের জনবিক্ষোভে উত্তাল কাশ্মীর, হিংসা

গ্রেটার কাশ্মীর খবরের কাগজের বিভিন্ন রিপোর্টের সূত্র ধরে সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৭ মার্চ •

৫ মার্চ থেকে তিনদিন ধরে কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ও বিক্ষোভ চলছে। সরকারি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো দলই এই বিক্ষোভের ডাক দেয়নি। ২০১০ সালের গ্রীষ্মকালের পর ফের বিক্ষোভে কেঁপে উঠছে কাশ্মীর উপত্যকা। রাস্তায় রাস্তায় শোনা যাচ্ছে ভারত বিরোধী এবং স্বাধীনতার দাবি নিয়ে শ্লোগান।

কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার খানপোরা সেতুর কাছে কয়েকজন প্রতিবাদী যুবক আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদ করছিল ৫ মার্চ মঙ্গলবার। সেই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাক যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেই ট্রাকে উত্তেজনার বশে দুটো পাথর ছোঁড়া হয়েছিল সেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক থেকে নেমে গোটা এলাকায় অত্যাচার শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। প্রতিবাদে আবার বিক্ষোভ হলে সেনাবাহিনী পরপর গুলি চালায় ওই প্রতিবাদী সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে। লুটিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন কিশোর যুবক। চব্বিশ বছর বয়সি তাহির আহমেদ সফির মাথায় গুলি লাগে। মারা যায় সে। হত্যাকাণ্ড চালানোর পর গোটা গ্রামে অত্যাচার চালায় সেনাবাহিনী।

এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা। কোনো দল, সংগঠন — কেউই হরতাল বা বনধ ডাকেনি, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধ চলতে থাকে। বারামুল্লা শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দাবি জানায়, অবিলম্বে যারা গুলি চালিয়েছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। মঙ্গলবার রাত থেকে সারা কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন থানা এলাকায় কার্ফু জারি হয়। শ্রীনগর শহরে রাইনাওয়ারি, নোহাট্টা, এসআরগঞ্জ, সারাফ কাদাল, জাদিবল, মাইসুমা, ক্রালখুদ থানা এলাকায় কার্ফু জারি হয়। বারামুল্লা, সোপোর, পুলওয়ামা এবং কুলগাও শহরেও কার্ফু জারি হয়। এই সমস্ত জায়গায় ৬ মার্চ বুধবার কার্ফু ভেঙ্গে মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভে রাস্তায় নামে। আলি কাদালে জমায়েতের ওপর পুলিশ ও সিআরপিএফ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে, বেত চালায়। মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখায় খানিয়ার, লালবাজার, কানিতার, হাওয়াল, করণ নগর, যাকুরা, চানাপুরা এবং বারজুলাতে। কার্ফু অগ্রাহ্য করে চাট্টাবাল এলাকায় লোকে রাস্তায় নামে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে পাথর ছোঁড়ে। গোটা শ্রীনগর, বুদগাঁও শহরে সম্পূর্ণ হরতাল চলে। কূপওয়ারা, বারামুল্লা, হান্দওয়ারা, ত্রেঘাম, বান্দিপোরাতে হরতাল ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে থাকে।

দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা ও কুলগাও জেলায় কার্ফু অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভ হয়। কাকাপোরায় ঘরে ঘরে ঢুকে আক্রমণ চালায় নিরাপত্তাবাহিনী।

এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের পরপরই নিরাপত্তা বাহিনীর রাতে হানা, তাদের গুলিতে ফের যুবকদের মৃত্যু শুরু হয় (১৩ মার্চ, জুনিমার), শুরু হয় নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আত্মঘাতী হানা (১৩ মার্চ, বেমিনা), সংগঠিত বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলির স্ট্রাইক, সরকারের কার্ফু।

একজন বাসিন্দা বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী যা শুরু করেছে তাতে ২০১০ সালে গ্রীষ্মকালে পরপর নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে কাশ্মীরি যুবকের মৃত্যু, পাল্টা বিক্ষোভ, সেখানে গুলিচালনা ও ফের মৃত্যুর যে চক্র, তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে এবারও।

ফুকুশিমার দ্বিতীয় বর্ষে কুডানকুলামে অবরোধ

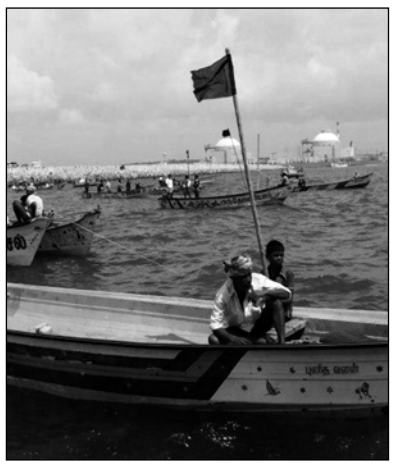

১১ মার্চ কুডানকুলামে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী পরমাণু চুল্লির কাছে সমুদ্রে ৬০০টি বোটে কালো পতাকা লাগিয়ে প্রতীকি অবরোধে শামিল হয়। অবিলম্বে বিপজ্জনক ও ত্রুটিপূর্ণ এই পরমাণু প্রকল্প বানচাল করে তার জায়গায় একটি নবীকরণযোগ্য শক্তির পার্ক তৈরির আহ্বান জানায় আন্দোলনকারীরা।

এদিকে কলকাতা বইমেলা চলাকালীন এবং পরে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৩৪ জন ব্যক্তি ও দুটি সংস্থার কাছ থেকে মোট ১৫,০০০.০০ (পনেরো হাজার টাকা) অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে কুডানকুলাম বিরোধী সংগ্রামে অর্থসাহায্য হিসেবে। এর মধ্যে প্রথম দফায় ৫০০০ টাকা পাঠানো হয়েছে। পরে ১৩ মার্চ বাকি ১০,০০০ টাকা পাঠানো হয়েছে। যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের নাম ও বন্ধনীতে অনুদানের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল : *সুজয় বসু (৫০০), কিরীটি রায় (১০০০), অমিতা নন্দী (১০০০), শান্তনু চক্রবর্তী (২০০.০০), তুষার চক্রবর্তী (৫০০.০০), সুমিতা দাস (৫০০.০০), ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (৫০০.০০), নিত্যানন্দ ঘোষ (৫০.০০), প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (১০০.০০), অরুণ কান্তি বিশ্বাস (২০০.০০), অচ্যুত সেনগুপ্ত (১০০.০০), বিশ্বজিৎ রায় (৫০০.০০), রাজকুমার গুপ্ত (১০০.০০), গর্গ চ্যাটার্জি (১০০.০০), সৌরীন ভট্টাচার্য (১০০০.০০), তমাল ভৌমিক (১০০.০০), মিহির চক্রবর্তী (৫০০.০০), পার্থ নাগ (২০০.০০), সমর বাগচি (৫০০.০০), কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল (৫০.০০), সজল রায়চৌধুরি (২০০.০০), অরুণ ভট্টাচার্য (৫০.০০), ধীরাজ বোস (৫০০.০০), কাজল সেন (১০০.০০), প্রদীপ মিত্র (১০০.০০), নিখিলেশ পাল (১০০.০০), সুমিত চক্রবর্তী (১০০.০০), অসিত রায় (১০০.০০), ভাস্কর শূর (২০০.০০), প্রদ্যুম্ন ব্যানার্জি (২০.০০), পঞ্চাদ্রি কর্মকার (১০০.০০), নারায়ণ নন্দী (৫০০.০০), তপতি ঘোষ (২০০০.০০), মনোজ পাল (১০০০.০০), মিহির চক্রবর্তী (৫০০.০০), দিশা (সংস্থা) (২২৩০.০০)।*

বাংলাদেশের চিঠি

'এত দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন আর কখনো হয়নি স্বাধীন বাংলায়'

পলাশ চৌধুরি, ১৫ মার্চ •

জয় গুরু, দাদা। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের কার্যক্রম, আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে আমরা এক মায়ের সন্তান। অথচ দুর্ভাগ্য, একই ছাদের নিচে থেকেও আমাদের অনেকে আজ বিভক্তির পথ বেছে নিয়েছে। পরিস্থিতির কারণে আমার যোগাযোগ রাখাটা অনিয়মিত হচ্ছে। আপনার প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় আমরা বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

আমি রাজনৈতিক বোদ্ধা নই। কিন্তু শিল্পী হিসেবে আমার সামাজিক দায়বোধ আমায় তাড়িত করে। দেশের শুধু নয়, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে অস্থিরতা, অনৈতিকতার আস্ফালন ... ধর্মের নামে ক্ষমতার লড়াই .. পুঁজির স্বেচ্ছাচার ... শাসনের নামে শোষণ .... সবকিছুই সচেতন মানুষকে ভাবায়, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু পুঁজির তৈরি করা টিকে থাকার লড়াই মানুষকে আজ বড্ড একা করে দিয়েছে। বিশ্বে ৭০০ কোটি মানুষ, সবাই একা।

আজকের এ আন্দোলন পেরেছিল এই একাকিত্ব ঘুচিয়ে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করতে। যার টানে আমিও নেমেছি পথে। ক্ষমতাসীনদের মধ্যস্ততায় বৈদেশিক শোষণে জর্জরিত আমরা। আর এ নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলার স্বপ্নে বিভোর একা হয়ে পড়া মানুষগুলো পাশাপাশি হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হঠাৎ এক আশার সূর্যোদয়ের হাতছানিতে নেমে পড়ে রাজপথে। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে আমরা তরুণ সমাজ অভিভাবক শূন্য বেড়ে উঠেছি। এর সুযোগ নিয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা। আর বিশ্বায়নের অসম দৃষ্টি শহর আর গ্রামকে করেছে বিভাজিত। এইসকল কিছুর বিরুদ্ধে শাহবাগে তরুণদের এ জাগরণ বলে আমি মনে করি। তা রাজাকারের ফাঁসির দাবির মতো সার্বজনীন এক সুরে সূত্রপাত হয়েছে।

এত দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন আর কখনো হয়নি স্বাধীন বাংলায়। তাই স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলেরা আজ আতঙ্কিত। তাই এ তরুণ সমাজের সূচিত করা আন্দোলনকে কব্জা করে তারা তাদের চিরায়ত ভোটের রাজনীতিতে একে ব্যবহারের পাঁয়তারা শুরু করে। আন্দোলনকে কলংকিত করবার চেষ্টা শুরু হয়েছে আজ। অপরদিকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা সরল ধর্মপ্রাণ বাঙালিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। জামায়াতে ইসলাম, যারা জন্ম নিয়েছিল ধর্মকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের শোষণ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, তারা কালে কালে সকল সময়ের ক্ষমতাসীন দলগুলোকে ব্যবহার করে এবং বাংলাদেশের সরল মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে আজ ব্যাপক শক্তি অর্জন করেছে। এর সাথে বৈদেশিক ইন্ধন তো আছেই। আজ গ্রামের সরল মানুষ থেকে শহরের নানান জটিলতা ক্লিষ্ট তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্দরলোক সকলে বিভ্রান্ত, বাম ডান কেউ বাদ নয়। মাদ্রাসা এবং মসজিদকে অপব্যবহার করে দেশের প্রতিটি প্রান্তে জামায়াতে ইসলাম শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। আন্দোলনকে নিয়ে নানা অপপ্রচার–গুজব ছড়াচ্ছে তারা। চাঁদে সাঈদীকে দেখা কিংবা আন্দোলনকারীরা সব নাস্তিক ... ইহুদিদের মদত ... মসজিদ ভেঙ্গে ফেলছে ইত্যাদি। এর বিরুদ্ধে কথা বললে পুড়িয়ে পর্যন্ত মারছে। অপরদিকে জামায়াতে ইসলাম বিরোধী ইসলামিক রাজনৈতিক জোটকেও পেছন থেকে মদত দিচ্ছে তারা। বহুরূপী এক অবস্থান তাদের।

সম্পাদকের কথা

গণহত্যার নায়ককে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা যায়?

গুজরাতের নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে দেশের কর্পোরেট শিল্পপতিরা। দেশের অর্থনীতিতে মন্দা দশা। বাজার মন্দা, বিক্রি নেই, তাই একের পর বড়ো বড়ো প্রকল্প রূপায়ণে গড়িমসি চলছে। ঘটা করে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সরকারি সিদ্ধান্তের পর মাস তিনেক কেটে গেলেও কেউ বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেখায়নি। তার ওপর কর্পোরেট জমি দখল, পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে দেশের শত শত জায়গায় লড়ছে গ্রাম শহরের মানুষ — এও এক বাধা! এই শত প্রতিকূলতায় গোটা দেশে কর্পোরেট পুঁজি যখন আপাতত খুঁড়িয়ে হাঁটছে, গুজরাতে কিন্তু তা দৌড়চ্ছে। একের পর এক প্রকল্প হচ্ছে — সৌরবিদ্যুৎ থেকে টাটা ন্যানো। লোকের ওজর আপত্তি দাবড়িয়ে দিয়ে, দু-দিন বাদে সেগুলো সমাজের কাজে লাগবে কিনা না ভেবে, মোদির সরকার একের পর এক কর্পোরেট প্রকল্প রূপায়ণে পয়সা আর পুলিশ নিয়ে শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। এটারই মিডিয়ার দেওয়া নাম, 'গুজরাতের আশ্চর্য্য বৃদ্ধির গল্প'। অবস্থা দেখে যারপরনাই আহ্লাদিত এক কর্পোরেট বস কিছুদিন আগে তো বলেই ফেলেছেন, 'মোদি গুজরাতের মানুষকে কী ওষুধ খাইয়েছেন কে জানে, সবার মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার বাসনা যেন টগবগ করে ফুটছে!' বলাই বাহুল্য, এ গুজরাতের আসল ছবি নয়। পরিসংখ্যান নিয়ে কারবার যারা করে, তারাও বলছে, গুজরাতে ধনী গরিবের ফারাক দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পেট পুরে খেতে পায় না, এমন মানুষের সংখ্যাও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। কিন্তু তাতে কর্পোরেটদের কিছু আসে যায় কি?

এই ঢক্কা নিনাদের আড়ালে মোদির আরেকটি রূপ চাপা পড়ে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি ২০০২ সালের গুজরাত গণহত্যার অন্যতম নায়ক। সেই গণহত্যায় মারা গিয়েছিল কয়েক হাজার মানুষ। রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হয়েছিল ধর্ষণ, সম্পত্তিহানি, ঘর পোড়ানো — আরও অনেক মানবতাবিরোধী অপরাধ। সেই অভিযোগগুলি থেকে মুক্তি পেতে সরকারি নথি লোপাট করা হয়েছে, জেল খাটিয়ে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমলা বা পুলিশ অফিসারদের ... গুজরাত গণহত্যার সার্বিক তদন্ত বা বিচার, কোনোটাই এখনও হয়নি। প্রতিবেশী বাংলাদেশে আজ ৪২ বছর বছর পরে গণহত্যাকারীদের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে বিচার হচ্ছে, সর্বোচ্চ সাজা পাচ্ছে যারা, তাদের কেউ কেউ দেশের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিল কয়েক বছর আগে।

কাজির বিচারে দোষি সাব্যস্ত এখনও না হলেও, দেশ তথা বিশ্বের মানুষ জানে, মোদি গণহত্যার নায়ক। একজন গণহত্যাকারী, তা সে যে পার্টিরই হোক, দেশের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মেনে নেওয়া যায়?

বাংলাদেশ আপডেট

যুববিদ্রোহ জারি, জামাতের ব্যাপক হিংসা, পাল্টা হিংসা পুলিশের; নাস্তিকদের কন্ঠরোধ সরকারের

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১৫ মার্চ •

১ মার্চ বিদেশ থেকে ফিরে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়া লিখিত বিবৃতিতে শাহবাগের আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, জামাত-ই-ইসলামির কর্মীদের পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার তীব্র নিন্দা করেন এবং সরকারকে হুঁশিয়ারি দেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। ৩ ও ৪ তারিখ জামাত-ই-ইসলামির হরতালের পরদিন, ৫ তারিখ ফের হরতাল ডাকেন তিনি। যদিও জামাত-শিবিরের হিংসার কোনো নিন্দা তিনি করেননি। গণজাগরণ মঞ্চ জানায়, খালেদার বক্তব্যে তারা হতাশ।

২ মার্চ রাজধানীর নয়াপল্টন, শান্তিনগর ও মালিবাগ এলাকায় আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার পাঁচজনের পড়াশুনা স্থগিত রাখল বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের আহ্বানে রংপুর কারমাইকেল কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। সব সরকারি, বেসরকারি ও আবাসিক ভবনে এবং গাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে শাহবাগের আন্দোলনের প্রতি আজ শনিবার একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।

রাজধানীর তোপখানা রোডের শহিদ আসাদ মিলনায়তনে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস, আতঙ্ক ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ঘৃণ্য তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান ১০টি বাম প্রগতিশীল সংগঠনের। এদিন নীলফামারী শহরের জলঢাকা উপজেলার রাজারহাট এলাকায় জামাত-শিবিরের সশস্ত্র মিছিল, বিজিবির গুলিতে নিহত একজন।

৩ মার্চ শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর থেকে হরতালবিরোধী মিছিল। বোয়ানের আহ্বায়ক ইমরান এইচ সরকারের এক বিবৃতিতে সব ধর্মপ্রাণ মানুষদের একসঙ্গে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসি দাঙ্গাবাজদের প্রতিরোধের ডাক দিয়েছে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মঞ্চ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আপনারা এক হয়ে এই জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসি বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।'

এদিকে হরতাল সফল করতে মাঠে নামে জামাত। চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলার চাম্বল ইউনিয়নে আজ শনিবার বিকেলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের ওপর গুলি চালিয়েছে জামাত-শিবিরের কর্মীরা। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলায় সড়কের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ। বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা প্রশাসন চত্বরে আগুন। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলার মহিষালবাড়ি এলাকায় জামাত-শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, নয় বছরের শিশু রফিকুল ইসলাম নিহত। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তায় অবরোধ, ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে এক শিবির কর্মীর মৃত্যু।

জয়পুরহাট-বগুড়া সড়কের সদর উপজেলার হিচমী এলাকায় কয়েক হাজার জামাত সমর্থক একদল পুলিশকে ঘিরে ফেলে। তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ-বিজিবি যৌথভাবে গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়লে নিহত হয় ছয়জন — এদের প্রত্যেকের বয়স ১৬ থেকে ৩২-এর মধ্যে। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয় আরও প্রায় ২৫ জন।

অপরদিকে, পাঁচবিবি উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে জামায়াত-শিবিরের ৮-১০ হাজার নেতা-কর্মী মিছিল করে পাঁচবিবি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয় ও থানার ভেতরে দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ও অগ্নি সংযোগ করে। ঝিনাইদহে হরিণাকুণ্ডুতে জামাত-পুলিশ সংঘর্ষে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত, দশ পুলিশ আহত। সাতক্ষীরার রইচপুর এলাকায় বিজিবির দুটি টহলযানে জামাতের হামলা, বিজিবির সদস্যদের গুলিতে একজন নিহত ও তিনজন আহত। এই অঞ্চলে ভোর থেকেই জামাত-শিবিরের কর্মীরা খুলনা, আশাশুনি, কালীগঞ্জ, যশোর, বৈকারি ও ছনকা সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে।

রবিবার হরতালের কারণে রেল, সড়ক যোগাযোগ অচল হয় ঢাকায়। মিরপুর-১০ নম্বরের সি-ব্লকে সকাল আটটার দিকে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ঘটে বগুড়ায়। গতকাল শনিবার রাত থেকেই জেলায় গুজব রটে, একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডাদেশ পাওয়া জামাতের নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর চেহারা চাঁদে দেখা যাবে। রাত তিনটার দিকে জেলা শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে মাইকিং করে সবাইকে বের হয়ে তা দেখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এভাবে জড়ো হয়ে জামাত-শিবিরের কর্মীরা ভোর থেকেই মিছিল শুরু করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভাঙচুর চালাতে থাকে। সকাল সাতটার দিকে জামাত-শিবিরের কর্মীরা শাজাহানপুর থানায় হামলা করে। বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ একপর্যায়ে গুলি ছোড়ে। এই গুলিচালনায় বেশ কয়েকজন মহিলা সহ মোট তেরোজন মারা যায়। এইদিনই মারা যায় ৫ জন।

বগুড়া সদরের ইয়াকুবিয়া স্কুলের মোড়ে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে তিনজন নিহত হন। নন্দীগ্রাম উপজেলায় আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে জামাত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। এছাড়া, রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। দুপচাঁচিয়ায় থানা ঘেরাও করে জামাত-শিবির। শিবগঞ্জের মোকামতলায় দুজন নিহত।

খুলনার ফুলতলা থানার ওসিসহ তিন পুলিশকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে। দিনাজপুরে সদর উপজেলার রানিগঞ্জ উত্তর মহেশপুরে ১২টি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি ও খড়ের গাদা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাটোরে শহিদ মিনার ভাঙচুর ও লালপুর উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহিদ মিনার ভেঙে ফেলে জামাত-শিবিরের কর্মীরা।

৪ মার্চ কমলাপুর স্টেশনে একটি ট্রেনে আগুন দেয় জামাত-শিবির। ঢাকায় গাবতলীর মাজার রোডে ও মিরপুরে দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় হরতালের সমর্থকেরা। রাজধানীর রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের (বিটিভি) ফটকে হামলা চালায় হরতাল সমর্থকেরা।

মিরপুর, ফকিরাপুল, বিজয়নগর, মালিবাগ ও পল্টন এলাকা থেকে ককটেলের বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার কুশলা ইউনিয়নের লাকিরপাড় গ্রামের সংখ্যালঘুদের এক ধর্মীয় স্থানে আগুন লাগানো হয়। উল্লাপাড়া উপজেলায় এদিন সকালে পুলিশের সঙ্গে জামাত-শিবিরের কর্মীদের সংঘর্ষে এক নবম শ্রেণীর ছাত্র নিহত হয়েছে। সাতক্ষীরায় কলারোয়া-সরসকাটি সড়কে গাছ ফেলে জামায়াত-শিবির কর্মীরা অবরোধ করে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক থেকে গাছ সরাতে গেলে জামাত-শিবিরের কর্মীরা সরসকাটি পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। পরে পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা আবার ওই এলাকায় গেলে ওফাপুর গ্রামের জামাত-শিবিরের কর্মীরা তাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। একপর্যায়ে বিজিবির সদস্যরা গুলি চালালে তিনজন নিহত ও চারজন আহত হয়।

জামাতের ডাকা হরতাল প্রতিহত করতে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে মিছিল।

৭ মার্চ বিএনপি এনং জামাতের যৌথ হরতাল ঢিলেঢালাভাবে চলতে থাকে। ঢাকার পল্লবীতে সানিউর রহমান (২৭) নামের এক ব্লগার ছুরিকাহত হয়েছেন। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আজ গণজাগরণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণই ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাত-ই-ইসলামির নিবন্ধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০৯ সালে করা রিট আবেদন শুনানির জন্য হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের কার্যতালিকায় এসেছে আজ।

৮ মার্চ শাহবাগে নারী জাগরণী সমাবেশ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে। সমাবেশ চলাকালীন মঞ্চের কাছে কয়েকটি হাতবোমা এসে পড়ে। গণজাগরণ মঞ্চের স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল এইসময় সমাবেশকে ঘিরে লাঠি হাতে বারবার প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

নারায়ণগঞ্জে গণজাগরণ মঞ্চের উদ্যোক্তা রফিউর রাব্বির বড়ো ছেলে, দুদিন ধরে নিখোঁজ তানভীর তৌকির লাশ পাওয়া যায়। রাব্বি জানান, আমার ছেলের কোনো শত্রু নেই। আমার শত্রুরাই আমার ছেলেকে মেরেছে। পরদিন নারায়ণগঞ্জে হরতালের ডাক দেয় সাংস্কৃতিক জোট।

৪০টিরও বেশি দেশের কূটনীতিকরা চলমান হিংসার অবসানে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকারকে আবেদন জানায়। ব্রিটেন সহ কোনো কোনো দেশ সেনা মোতায়েনের প্রসঙ্গ তোলে।

১০ মার্চ জামাত-ই-ইসলামির নিষিদ্ধকরণ নিয়ে রিট-এর শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেছেন।

বাংলাদেশের স্বনামধন্য সংগীতব্যক্তিত্ব আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের ভাই মিরাজ উদ্দিন আহমেদের লাশ উদ্ধার। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে করা মামলায় বুলবুল সাক্ষী ছিলেন। রাজশাহীতে পুলিশকে আক্রমণ করে অস্ত্র লুঠ জামাতের।

ব্লগ, ফেসবুক, ইন্টারনেট, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তিকারীদেরকে শনাক্ত করতে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। জামাতের সমান্তরাল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক জোট 'হেফাজতে ইসলাম' 'ইসলামবিদ্বেষী ব্লগারদের অপতৎপরতা বন্ধ এবং তাদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনার' দাবি জানিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে।

১১ মার্চ নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশে হিংসা, পরদিন হরতালের ডাক। পরে বিএনপির কার্যালয়ে ঢুকে পুলিশের অস্ত্র উদ্ধার ও শতাধিক বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামে আগামী ১৩ মার্চ গণজাগরণ মঞ্চের মহাসমাবেশ বাতিল করার দাবিতে সেইদিনই চট্টগ্রাম জুড়ে হরতালের ডাক হেফাজতে ইসলামের। ১৪৪ ধারা জারি করে কোনোরকম সভা সমাবেশ বন্ধের প্রশাসনিক ফরমান চট্টগ্রামে। রাজধানীতে বিজিবি নামল সন্ধ্যের পর।

১৫ মার্চ আশুলিয়ায় বস্ত্র শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে গণজাগরণ মঞ্চের বিশাল সমাবেশ। সমাবেশ শুরুর আগে সমাবেশস্থলের কাছে ককটেল বিস্ফোরণ। সমাবেশে গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের বিষয়ে ইমরান বলেন, এই শিল্পের শ্রমিকদের ৯০ ভাগই নারী। এ দেশের নারীরা যখনই রাজপথে নামতে শুরু করেছে, তখনই জামাত-শিবির প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছে, যাতে নারীরা কাজ করে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে না পারে। হেফাজতে ইসলামের পাল্টা সমাবেশের ডাক সফল হয়নি।

খালেদার ঘোষণা, শাহবাগ 'নাস্তিক চত্বর'। আশুলিয়ার গণজাগরণ সমাবেশে এক ছাত্রনেতার বক্তব্য, 'ধর্মপ্রেম দিয়ে আমরা দেশপ্রেম শিখেছি। আমরা সবাই বাংলাদেশি, জন্মসূত্রেই পাওয়া ধর্ম পালন করে থাকি।'

প্রথম পাতার পর সীমান্তে সংহতি

সীমান্তের বাধা টপকাতে পারছি না। তবু ফারুক, শুভ, দীপঙ্কর এরকম কয়েকজন ঠিক পাশ কাটিয়ে জিরো পয়েন্টের গেট অবধি চলে গেল। আমিও ওদের পিছু পিছু গেলাম। আমার হাতে মন্থন পত্রিকার কিছু কপি দেখে ওপারের একজন ভাই ইশারায় চাইলেন। আমি দিতে যেতেই সাদা পোশাকের পুলিশ আমাকে আটকালো। তা সত্ত্বেও ম্যানেজ করে কাগজগুলো ওদের হাতে পাশ করে দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে আমাদের মিছিলের জমায়েতটা অধীর হয়ে তৃতীয় ব্যারিকেড পার হয়ে অনেকটা সামনে চলে এল। আর ওই প্রতিনিধিরা ফিরে এসে জানালো আমাদের বক্তব্য এবং কাগজপত্র নিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে পাঁচজন। (জানি না ওরা কাদের প্রতিনিধি! এই প্রতিনিধি ব্যাপারটা সবসময়ই বেশ গোলমেলে!) রঙ্গপীঠের এক মহিলা শিল্পী এসে সোজাসুজি বললেন, তিনিও বাংলাদেশের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চান। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করা হল। তাতে কী! আমরা আবার এদিক-সেদিক করে গেটে পৌঁছে গেলাম। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মত ও কাগজপত্র বিনিময় হল। সকলে হাত বাড়িয়ে দিল মেলানোর জন্য। একটা কাগজ পেলাম, দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে আল্টিমেটাম ১-৬, নিচে 'গণজাগরণ মঞ্চ, প্রজন্ম চত্বর, যশোর'। বুঝলাম যশোরের আন্দোলনকারীরা এখানে এসেছে, সঙ্গে শাহবাগের কয়েকজনও আছে। সেই কাগজটায় লেখা ছিল :

আল্টিমেটাম ১ : সাতদিনের মধ্যে জামায়েত-শিবিরের হাতে শহিদদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে।

আল্টিমেটাম ২ : ছাব্বিশে মার্চের পূর্বে জামায়েত-শিবিরকে নিষিদ্ধের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসেবে বিচারের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

আল্টিমেটাম ৩ : জামায়েত-শিবিরের অর্থকরী প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা আইনের আওতায় আনার জন্য অবিলম্বে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

আল্টিমেটাম ৪ : ট্রাইবুনালকে স্থায়ী রূপ দিতে হবে অবিলম্বে।

আল্টিমেটাম ৫ : অবিলম্বে জামায়েত-শিবিরকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

আল্টিমেটাম ৬ : যুদ্ধাপরাধী পক্ষের গণমাধ্যমগুলোকে আইনের আওতায় আনতে হবে।

পত্রিকা পর্যালোচনা : তবু বাংলার মুখ

তমাল ভৌমিক, কলকাতা, ১৪ মার্চ •

'তবু বাংলার মুখ'-এর দ্বাদশবর্ষে প্রকাশিত 'বইমেলা সংখ্যা : ২০১৩' হাতে এসেছে। ১০ টাকা দামের ৪৮ পাতার এই লিটল ম্যাগাজিন সর্বতোভাবেই প্রবন্ধের এবং এর মূল বিষয় : বাংলা ও বাঙালি। 'দেশভাগের বিনির্মাণ' প্রবন্ধে অসিত রায় দেশভাগের আগের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে 'দেশভাগের জন্য জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বই নয়, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের ক্যাবিনেট-মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও দায়ী এবং ক্ষমতালোভী, স্বৈরতন্ত্রী, বর্ণবাদী দিল্লির শাসকরাই দেশভাগ করেছিল একটা শক্ত কেন্দ্র ও দুর্বল প্রদেশ গড়ে ভারত সাম্রাজ্য-রাষ্ট্রের আদর্শভিত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এর ফলে 'ভারতের অঙ্গরাজ্যে জাতি পরিচয়হীন ৯ কোটি বাঙালি পৃথিবীর বৃত্তম জাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্রতম জাতির চেয়েও করুণ অবস্থায়' আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষ 'বহুজাতিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, গভীর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে, এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে ...। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির উত্থান সারা বিশ্বের বাঙালিকে সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে এক নতুন ইতিহাসের পথ দেখাচ্ছে। মজার কথা হল, অসিত রায়ের এই লেখা যখন রচিত হয়েছে, তখনও বাংলাদেশের শাহবাগের আন্দোলন শুরু হয়নি। অথচ শেষের কথাটা কেমন সাম্প্রতিক এই ঘটনার সঙ্গে মিলে গেল। যেন প্রতিধ্বনি আগে আর ধ্বনিটি পরে শোনা যাচ্ছে। আসলে তা নয়। যে 'ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন'-এর কথা অসিত রায় বলছেন তা ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। সেই অর্জিত বিজয় রক্ষিত থাকেনি এবং তার লড়াই এখনও চলছে, এটাই ঘটনা। শাহবাগের আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এটাই দেখাচ্ছে।

'ভারতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্র' নিবন্ধে মলয় বসু ভারতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অসারতা তুলে ধরে শেষে খানিকটা আশার আলো দেখিয়েছেন যে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। বিগত এক দশক ধরে আমরা দেখছি, এই পরিবর্তনের লক্ষণ। একদিকে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের বুলি, অন্যদিকে তথাকথিত সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি মানুষের মোহ কাটতে শুরু করেছে। শাসক বিরোধী নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক মাতব্বরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণমানসে জন্মেছে ঘৃণা আর হতাশা।' এরই চিহ্ন মলয় বসু খুঁজে পেয়েছেন 'কাশ্মীর বা মণিপুরের মতো প্রান্তিক মানুষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে', 'আদিবাসীদের মতো সমাজের নিম্নতম প্রান্তিক মানুষরা হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ায়' আর 'সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মতো কৃষক সংগ্রাম, মেকি বামপন্থীদের কবর রচনা করায়'। এরপরে তিনি উপসংহার টেনেছেন এই বলে, 'এমতাবস্থায় আজ বিশেষ প্রয়োজন একটি শক্তিশালী নাগরিক সমাজ। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।' 'শক্তিশালী নাগরিক সমাজ মানে কী, কোন ইতিহাসের এই শিক্ষা, তা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না।

দুটি প্রবন্ধ আছে বাঙালিদের নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়া নিয়ে — 'নিজভূমে ছিটমহলের অনাগরিক বাসিন্দা' (পশ্চিমবঙ্গ পিইউসিএল) এবং 'ভারতের নাগরিক আইন ও বাঙালি' (কুমুদরঞ্জন বিশ্বাস)। ইংরেজি ও হিন্দির দাপটে বাংলাভাষার সংকট নিয়ে লিখেছেন নীতিশ বিশ্বাস ও স্বপন মজুমদার। পার্থ বসু ও কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে-র ভাষা আন্দোলন ও ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সুভাষ দাস, সংখ্যালঘু সংরক্ষণ সম্পর্কে এমদাদুল হক লিখেছেন। 'নজরুল ফাউন্ডেশন : অখণ্ডতার ঐকান্তিক প্রয়াস' বিষয়ে লিখেছেন মূর্শিদ এ এম। রঙ্গলোকের পরশপাথর নাট্যসমালোচনা করেছেন অরূপ শঙ্কর মৈত্র। রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার ব্যঞ্জনায় গোলাম মূর্তাজা লিখেছেন, 'দেশকে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু ভাগ হননি রবীন্দ্রনাথ-নজরুল'। আবার, রবীন্দ্রনাথ সহ দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র সত্যেন দত্তকে একেবারে ধরে ধরে সমালোচনায় বিভক্ত করে 'নজরুলকে, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা বানানোর একটি প্রস্তাবনা' পেশ করেছেন বিশ্বময় চৌধুরি যা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। প্রতিদিন পত্রিকায় সূত্রে নবনীতা দেবসেনের লেখা 'শ্যামলীদির চালচিত্র' এবং গৌতম চৌধুরির সূত্রে ফরহাদ মাজহারের লেখা 'বাংলাদেশের সাহিত্যে যত্রতত্র আরবি ঢুকে গেছে!' পত্রিকাকে ঋদ্ধ করেছে। বিশেষত শেষোক্ত প্রবন্ধে বাণী বসুর বাণী (যা শিরোনামেই আছে) সম্পর্কে লেখকের এই ব্যাখ্যা মনে রাখার মতো — — 'শেষাবধি এই অসুখ সাইকোলজিকাল নয় — — এমনকী তার প্রকাশ অনেক সময় সাম্প্রদায়িক মুসলমানের মামলাও নয়, বরং বর্ণ ও শ্রেণীর মামলা। ... সমাজের নিচের তলার মানুষগুলোর ভাষা যখন — — বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নিতে চাইছে ... তখনই এই অসুখ ধরা পড়তে শুরু করেছে।'

হালকা সবুজ কাগজে মোড়া এই পত্রিকার প্রচ্ছদে ইমরান হোসেন পিপলুর ছবি খুব সুন্দর মানিয়েছে। শেষ প্রচ্ছদে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর কবিতা 'পুব-পশ্চিম'ও। তবে বাংলা ভাষা যে পত্রিকায় এতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে তাদের বানানের ভুল বা মুদ্রণপ্রমাদের এত আধিক্য মেনে নেওয়া যায় না।

চূর্ণী নদীর দূষণ রোধে হাইকোর্টের রায় কার্যকর করেনি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদ

শমিত আচার্য, শান্তিপুর, ১২ মার্চ ছবি উজান চট্টোপাধ্যায়

প্রায় মাস খানেক ধরে চূর্ণী নদীর জল নর্দমার জলের মতো মিস মিসে কালো থাকার পর আবার স্বাভাবিক চেহারায় ফিরছে। আর তাতেই কিছু কিছু মানুষের মধ্যে আবার উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে কিছুদিনের মধ্যেই আবারও নোংরা তৈলাক্ত বর্জ্য পদার্থে চূর্ণীর জল কালো ও দূষিত হয়ে পড়বে। নদীকে চিরস্থায়ী দূষণমুক্ত করার প্রচেষ্টা যে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া দরকার সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করেছে।

বাংলাদেশের একটি চিনিকলের নোংরা জল ও বর্জ্য বহুদিন ধরেই মাথাভাঙা নদীতে পড়ছে। মাথাভাঙা নদী নদিয়ার মাজদিয়াতে এসে চূর্ণী নদীতে মিশছে, আবার চূর্ণী নদী পায়রাডাঙ্গাতে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। সুতরাং ওই নোংরা বর্জ্য সরাসরি তিনটি নদীকে দূষিত ও কলুষিত করছে। অথচ স্টকহোম ঘোষণাকে স্বীকৃতি দিয়েই দূষণ সংক্রান্ত আইন রচনার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয় আমাদের দেশে। জল দূষণরোধের জন্য আইন ১৯৭৪ ও পরিবেশ দূষণ সুরক্ষা আইন ১৯৮৬-ও তৈরি করা হয়। জল দূষণরোধের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত নোংরা জল ক্ষতিকর তরল বর্জ্য ফেলা থেকে বিরত করতে প্রতিটি শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধনাগার বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসাতে নির্দেশ দেয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সরকারকে দেখতে হবে সেই নির্দেশ প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকর করছে কিনা। পরিশোধনাগার বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলি ঠিকমতো চালানো হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা না থাকায় শেষ পর্যন্ত জল দূষণরোধে কার্যত কিছুই হয়নি। বেশিরভাগ শিল্পকারখানায় পরিশোধনাগার নেই, নালা নর্দমার জল সরাসরি নদীতে ও জলাশয়গুলিতে পড়ছে। চিনিকলের বর্জ্য ৫৪ কিমি ব্যাপী চূর্ণী নদীতে পড়ছে। এখন দেখা যাচ্ছে বছরে তিন থেকে চারবার এই বর্জ্য নদীটিকে দূষিত করছে। ফলে দীর্ঘ এই নদীটির জলজ প্রাণী ও মাছ মরে ভেসে উঠছে। মারাত্মক দুর্গন্ধ নদীর জলের মধ্যে থেকে আসায় আশেপাশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। জানা গেছে রানাঘাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে কলকাতা হাইকোর্টে। গত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্ট এক রায়ে চূর্ণী নদীর ৫৪ কিমি পথ দূষণমুক্ত করতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদকে নির্দেশ দেয়। অথচ রাজ্য দূষণনিয়ন্ত্রক পর্ষদ এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে বিষয়টি অবহিত করে চূর্ণী নদীকে দূষণমুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সস্তায় বাজিমাৎ চাই, তাই নিরাপত্তার পরোয়া নেই

উল্টোডাঙার উড়ালপুল ভেঙে পড়ল

অনুভব কর্মকার, কুঁদঘাট, ১৪ মার্চ •

টালিগঞ্জ থেকে কুঁদঘাট মেট্রোর যে লাইনটা গেছে, সেই জায়গাটাও কাস্তের মতো বাঁকা। তাই সেখান দিয়ে আসতে কখনো কখনো অস্বস্তি হয়, ভয় লাগে। কোনো একটা সময় যে সেখানকার একটা চাঙর ভেঙে পড়বে সেটা ভাবা যায় না। আমি দেখি, ওই সময় ট্রেন আস্তে করে দেওয়া হয়, হয়তো ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই।

খবরে প্রকাশ, উল্টোডাঙার ভেঙে পড়া উড়ালপুলের চাঙরটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, ডিজাইনটি আরেকটু ভালো হওয়া উচিত ছিল, একটা অতিরিক্ত ক্যান্টিলিভার দেওয়া গেলে ভালো হত ...। কিন্তু বিষয়টি মূলত অর্থনৈতিক।

আগেকার দিনে যখন ডিজাইন করা হত, তখন বলা হত 'ফ্যাক্টর অফ ইগনোরেন্স', যেটাকে পরে বলা হয়, ফ্যাক্টর অফ সেফটি বা নিরাপত্তার কারণে কিছুটা বাড়তি গঠন করা। মানে দাঁড়ায়, যদি ওই উড়ালপুলটি ২০ টন ভার বহন করতে সক্ষম বলে বলা হয়, আসলে সেটি ২০-র কিছু বেশি পরিমাণ ভার বহনে সক্ষম হিসেবে ডিজাইন করা হয়। তাতে কাঁচামাল বেশি খরচ হয়, গঠনের জন্য আনুষঙ্গিক খরচও কিছুটা বেশি ধরতে হয়। এখন কোম্পানি ডিজাইনারকে বলে দেয়, যথাসম্ভব কম ফ্যাক্টর অফ সেফটি রাখতে, যাতে কোম্পানির লাভটা বেশি হয়।

তাছাড়া একজন ডিজাইনারের কাজ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন তার ডিজাইনটি মেনে কাজটা সম্পূর্ণ হয় এবং জিনিসটির কমিশনিং হয়। বাস্তবে দেখা যায়, একজন ডিজাইনার যেরকম ভাবছে বা বলে দিচ্ছে, কার্যক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। ফারাক হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দেখা যায়, অনেক কোম্পানিরই ডিজাইনের ডিপার্টমেন্টটি হল নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু নির্মাণকার্যে তাদের নিজস্ব কোনো লোক থাকে না। সস্তায় যাতে কাজটা হয়, তার জন্য নির্মাণের ভার দেওয়া হয় কোনো কন্ট্রাক্টরকে, তারপর আবার তা কোনো সাব কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেয় কন্ট্রাক্টর। সেই সাব কন্ট্রাক্টর ফের সাব কন্ট্রাক্টে দিতে পারে। এগুলি সবই করা হয় প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ লাভ কামানোর জন্য। কিন্তু এটা করতে গিয়ে প্রচুর অদক্ষ শ্রমিকরা নির্মাণকার্যে ঢুকে পড়ে এবং নির্মাণে যে গুণমান বজায় রাখা দরকার, তা অনেকসময়ই বজায় থাকে না।

আগে যখন এসব করা হত, তখন গুণমান বজায় রেখে ধীরে ধীরে কাজটা করা হত। কিন্তু এখন খুব কম সময়ের মধ্যে কাজটি করে ফেলার পরিকল্পনা থাকে। এটা করতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুণমানের দিক বজায় রাখা যায় না।

আরেকটা ব্যাপারও আছে। অনেক সময় দেখা যায়, ডিজাইনাররা খাতা-কলমে যে নিরাপদ ডিজাইনটি করে, তা বাস্তবে নিরাপদ না-ও হতে পারে। তাই ডিজাইনও সেরকম হওয়া দরকার, যা বাস্তবধর্মী হয়।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সবটা করা সম্ভব হয় না। নকশা ও নির্মাণে অভিজ্ঞ পেশাদারদের দিয়ে এই কাজ করানো দরকার। নির্মাণের সময় নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিক থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, তাদের কাছ থেকে ডিজাইনের প্রতি মুহূর্তে মতামত নেওয়া ও সেই অনুযায়ী নকশায় দরকার মতো পরিবর্তন করা জরুরি।

একটা প্রকল্প হাতে নেওয়া হলে কত কম খরচে করা সম্ভব তা ভাবা হয়, তখন দক্ষ কি অদক্ষ, কী ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে তা নিয়ে মাথাব্যথা থাকে না, এতে ভুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আর একটা উড়ালপুল তৈরি হয়ে গেলে, তার রক্ষণাবেক্ষণের নিরন্তর একটি বন্দোবস্ত থাকা দরকার। এখানে এই রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

আমগাছের যত্ন নিতে আমাদের করণীয়

বরুণ ঘোষ (হরি), ঘুড়পেকে পাড়া (লক্ষীতলা), শান্তিপুর •

এই বছর বিশেষ করে আমাদের শান্তিপুরে আমবাগানে খুব ভালো মুকুল এসেছে। এবারের আবহাওয়া আমগাছের পক্ষে ভালো। মুকুল আসার আগে অর্থাৎ পৌষ মাসের প্রথমে প্রতি লিটার জলে ১/২ মিলি থেকে ১ মিলি আলফামেথ্রিন ১০% ইসি প্রয়োগ করে আমগাছটিকে ভাল করে ধোয়াতে হবে। প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য মুকুল দেরি করে বেরিয়েছে। এখনও মুকুল বেরোচ্ছে। একটি গাছে চার রকমের মুকুল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আগুড়ি (আগের) মুকুলে দানা অর্থাৎ আমের গুটি কম, মাঝারি ও নাকি মুকুলে আমের গুটি বেশ ভালো। কিন্তু দিনে গরম রাতে ঠান্ডা হলেই বিশেষত বোম্বাই আমের দানা নষ্ট হবার সম্ভাবনা। দানা একটু বড়ো হলে অর্থাৎ মটরের মতো হলে ডাইথেন এম ৪৫ প্রতি লিটার জলে এক থেকে দেড় গ্রাম করে প্রয়োগ করলে ভালো হয়। এছাড়া ভিটামিন প্রয়োগ করলে আম বাড়ে তাড়াতাড়ি। মুকুল বাহির হলে ২১ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে। ধষা পচা লাগলে ডাইথেন এম ৪৫ ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের শান্তিপুরে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে যদি বৃষ্টি হয়, তবে আরও ভালো ফলন পাওয়া যাবে। বিভিন্ন জাতের আম আমাদের শান্তিপুরে পাওয়া যায়। গুটি (আঁটি) আমের ফলন তো হবেই। এছাড়া হিমসাগর, ল্যাংড়া, বোম্বাই, গোলাপখাস, চ্যাটার্জী, কিসানভোগ, ফজলি, কপাট ভাঙ্গা, গোপালভোগ, আম্রপালি, মল্লিকা ও বিশেষ করে স্বাদে শান্তিপুর হিমসাগরের বিকল্প নেই। তবে শান্তিপুরে আম সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আমচাষিদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন করা হচ্ছে। আম সংরক্ষণ করা গেলে আমচাষিরা উপকৃত হবে।

সমন্বয় কুন্ডু, পঞ্চম শ্রেণী, শান্তিপুর

বর্তমান বাংলাদেশে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশ তো ভারতেরই অঙ্গ ছিল একসময়। যখন বাংলাদেশ বিপদে তখন পশ্চিমবঙ্গ চুপ থাকবে কেন? গত ৩ মার্চ বের হল পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দুটি মিছিল দু-দিকের বর্ডারের কাছে, 'রাজাকারদের ফাঁসির জন্য', যারা ১৯৭১ সালে প্রায় ৩০ লক্ষের বেশি বাংলার মানুষ মেরেছে। অথচ কজনই বা বেরোল 'ভারত' থেকে? যে কজন বেরোল তাদেরও আটকে দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বর্ডার থেকে প্রায় ২০০ মিটার আগে। তেমনি তারাও ঠাঁঠা রোদের মধ্যে বসে পড়েছিল রাস্তায়, ওপার বাংলার মানুষদের সঙ্গে দেখা করবে বলে।

'যারা এরকম কাজ করেছে একদিন তাদের হারতে হবেই / বাংলার মানুষের কাছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবেই। আমরা যেমন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সাথে ছিলাম তেমনি দ্বিতীয় যুদ্ধেও থাকব। চিরদিনই এক ছিলাম, আছি, থাকব। নাম বদলালেও ভালোবাসা বদলায় না।

উত্তাল শাহবাগের ঢেউ এ বাংলার শান্তিপুরে

অলোক দত্ত, শান্তিপুর, ৬ মার্চ •

ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্ম-পাষণ্ডরা মানবধর্মকে উল্লঙ্ঘন করেছে, নিজের ধর্মকে কলুষিত করেছে বাংলাদেশে। আর তাদের বিরুদ্ধে শাহবাগের আন্দোলনের কথা বিশ্ব জেনেছে। সমর্থনও করছে নতুন প্রজন্মের এই তীব্র দাবিকে। আওয়াজ উঠছে, ধর্ম-পাষণ্ডরা নিপাত যাক। এই বিষয় নিয়ে ৬ মার্চ সন্ধ্যে ছটায় শান্তিপুরের কাশ্যপপাড়ায় বন্ধুসভা হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল শান্তিপুর রঙ্গপীঠ।

অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা মঞ্চ হয়নি। বাংলাদেশের একুশের স্মারকস্তম্ভটির একটি প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল বক্তার পেছনদিকে। ঘোষিত মূল বক্তা ছিলেন বাংলাদেশের নাট্যকর্মী স্বপন গুহ। হলভর্তি শ্রোতা, বসার আসন ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে অনেকে। যেহেতু নাট্যদলের আয়োজিত অনুষ্ঠান, গান কবিতায় জমজমাট। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস সম্প্রতি উত্তাল বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন সপরিবারে। তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা বললেন, যা অনুষ্ঠানের মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করল। মূল বক্তা স্বপন গুহ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, বিশ্বের গতিপ্রকৃতি, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শাহবাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিএনপি ও নানা ধর্মীয় সংগঠনের বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা বললেন। একাত্তরের যুদ্ধে ধর্ম-পাষণ্ডদের কুকীর্তির কথাও বললেন। আন্দোলনের চিত্রটির প্রেক্ষাপট আরও সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠল যখন পর্দায় তথ্যচিত্রটি দেখানো শুরু হল। অনেকে শিউরে উঠলেন, এটাকে কী মৃত্যুমিছিল বলব! সার বেঁধে পড়ে আছে, জলে ভাসছে মানুষের মৃতদেহ।

অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ গবেষণাভিত্তিক তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছেন শঙ্কর আদিল খাঁ। সাক্ষীরা কেউ শহিদের বাবা, কেউ মা, কারোর ভাই বোন আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী। তাদের চোখের জল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে দর্শকের হৃদয়। চিনিয়ে দিচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের স্বরূপ, ধর্মের ধ্বজাধারী রক্তলোলুপতাকে।

কোচবিহারে স্কুলছাত্রদের উদ্যোগে আলোচনায় শাহবাগ

অনন্ত কর্মকার, কোচবিহার, ১৫ মার্চ •

কোচবিহারের বাবুরহাটের শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ স্কুলে ৭ মার্চ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রজন্ম চত্বরের আন্দোলনের সংহতিতে একটি সভা হয়। স্কুলের চার পিরিয়ডের পর প্রধানশিক্ষকের সভাপতিত্বে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি দিয়ে শুরু হয় সভা। শুরুতে ভাষাশহিদ এবং শাহবাগ আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে প্রদীপ জ্বালিয়ে তারপর শুরু হয় আলোচনা। সভাতে ছাত্র এবং শিক্ষকরা আলোচনা করে, রাজাকার ব্যাপারটা কী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার অসমাপ্ত অধ্যায়, শাহবাগ চত্বরের ইতিহাসটি কী রকম — এসব বিষয় নিয়ে কথা হয়। বর্তমান শাহবাগ আন্দোলন নিয়েও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হয় 'জনগণমন অধিনায়ক' গান গেয়ে।

গড়িয়ায় শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থনে সাংস্কৃতিক সভা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৪ মার্চ •

আজ গড়িয়া স্টেশনের নিকট ৪৫নং বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে 'লেখক শিল্পী ঐক্য মঞ্চ' ও 'অনুশা'র উদ্যোগে বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থনে একটি সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম দিবসকে সামনে রেখে এপারবাংলার সমস্ত গণহত্যাকারী ঘাতকদের বিচারের দাবি ওঠে সভা থেকে। কবিতা পাঠ, গান, আবৃত্তি ও বক্তব্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মৌলবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায় ও মুক্তবুদ্ধির স্বপক্ষে জোর দেওয়া হয়। এই সভায় রূপান্তর, অনুশা, বাংলার মুখ, সত্যম, হান্ড্রেড মাইলস, শমীবৃক্ষ প্রভৃতি পত্রিকা ও সংস্থা যোগ দেয়। এছাড়াও গণসঙ্গীতশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রলয় দেবনাথ, ছড়াকার 'রসিকবুড়ো' মোহাম্মদ আলি মণ্ডল এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ উপস্থাপনার মাধ্যমে সভাকে সমৃদ্ধ করেন। আর ছিল শাহবাগের আন্দোলনের পোস্টার প্রদর্শনী। শাহবাগের সমর্থনে প্রচার বন্ধ করা এবং গণহত্যাকারী রাজাকারদের মুক্তির দাবিতে আগামী ২৬ মার্চ কলকাতার ময়দানে মৌলবাদীদের ডাকে যে সভার আয়োজন করা হয়েছে, সেই সভার বিরুদ্ধে একটি গণস্বাক্ষর অভিযান চালানো হয়।

বড়তলা মোসলেম লাইব্রেরি মুমূর্ষু অবস্থায়

মেটিয়াব্রুজ

২৪ ফেব্রুয়ারি, শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াব্রুজ •

দর্জিসমাজের প্রাণকেন্দ্র বড়তলার বয়স আনুমানিক দেড়শো বছর। এর কিছুকাল পরে প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম নিল বড়তলা মোসলেম লাইব্রেরি। শতাব্দী-প্রাচীন এই পাঠাগারটি তখনকার দিনের কয়েকজন সচেতন মানুষের ভাবনা ও কর্মের ফল। ধীরে ধীরে নবগঠিত পাঠাগারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এক আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠল। নতুন ভাবনার প্রেরণাস্পর্শে এই পাঠাগার জনপদের শিক্ষা ও সমাজচেতনাকে বিকশিত করেছে। বেলাত আলি মাস্টার ও রহমান মাস্টার এর প্রতিষ্ঠাতা। একদা পাঠাগারের কাঁচা বাড়িটি ছিল বর্তমান হাফিজুদ্দিন বিল্ডিংয়ের জায়গাটায়। ওখান থেকেই পাঠাগারের রোজকার কাজকর্ম চলত। মাস্টারমশাইরা গুটিকয়েক পাঠকের বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দিতেন। এভাবেই গড়ে উঠেছিল পাঠকমহল। আধুনিক শিক্ষার এই সূত্রপাত রক্ষণশীল মানুষদের পছন্দ হল না। তারা 'গেল গেল' রব তুলে পাঠাগারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পাঠাগারের সাইনবোর্ড পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মাস্টারমশাইরা তাঁদের সঙ্কল্পে অটল রইলেন। এগিয়ে এলেন রিয়াসুদ্দিন হাজী, মোজাফফার হোসেন মালী, মৌলা মুন্সী, নুরুল হক মালী, কাশেম থান্দার, উনসুরদৌলার মতো সংস্কারমুক্ত উদারহৃদয়ের মানুষ। এঁদের সহযোগিতায় মাস্টারমশাইরা তাঁদের অন্তরের ইচ্ছাকে রূপ দিলেন, গড়ে উঠল বড়তলা মোসলেম লাইব্রেরির বর্তমান ভবন।

পরবর্তীকালে এই পাঠাগার জনপদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে সদা তৎপর ছিল। এরই আশীর্বাদধন্য হয়ে আখতার হোসেন, গোলাম রসুল, মোঃ তাহের, মোঃ আমিন, নূরনবী উকিল, বরজাহান মালী প্রমুখ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি স্থানীয় মানুষকে জীবনকে নতুনভাবে চেনাবার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। এঁদেরই নিত্য আড্ডায় রচিত হয় এলাকার শিক্ষার মানচিত্র।

একদা এই লাইব্রেরি ছিল প্রাণবন্ত, মানুষের আনাগোনায় সরগরম। কিন্তু আজ তা অনেকটাই ম্রিয়মান। পাঠকের অভাবে মৃতপ্রায় এই পাঠাগারটি এলাকায় উপেক্ষিত। বইয়ের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। নতুন বই কেনা প্রায় হয় না। বহু দুষ্প্রাপ্য বই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট-প্রায়। সর্বত্র চোখে পড়ে তদারকির অভাব। নিয়মের ঢিলেঢালা ভাব এখানে স্পষ্ট। দীর্ঘদিন এই পাঠাগারের কোনো গ্রন্থাগারিক নেই। মাত্র একজন করণিকের চেষ্টা লাইব্রেরির কাজকর্ম টিমটিম করে চলছে। পরিচালন সমিতির কোনো হেলদোল নেই। সদস্যরা বাৎসরিক চাঁদা মিটিয়েই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেন। লাইব্রেরির উন্নতির ব্যাপারে তাঁদের ইতিবাচক মতামত রয়েছে বটে, কিন্তু কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। গুটিকয়েক পাঠক খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা নাড়াচাড়া করে পাঠাগারের রোজকার কাজকর্ম সমাপ্ত করেন।

এই প্রাচীন পাঠাগারের বাড়িখানা সেই পুরোনোদিনের। ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি ছাড়াই পুরোনো ভিতের ওপর নতুন নির্মাণকার্য হয়েছে। ফলে পাঠাগারের দ্বিতল ব্যবহারে প্রাণের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। পাঠাগারের নিজস্ব শৌচাগার নেই। শোনা যায়, অদূরেই পাঠাগারের নিজস্ব জমি ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তা বেদখল হয়েছে।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 18 16 March 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

কুডানকুলাম থেকে ফিরে (শেষ পর্ব)

অমিতা নন্দী, কলকাতা, ১৪ মার্চ •

২০১২ সালের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর সারা দিনরাত ধরে ইডিনথাকারাই গ্রাম সরগরম। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে তৈরি হয়ে সবাই জড়ো হলাম গির্জার সামনে সভাপ্রাঙ্গণে। সেখান থেকে এক বিশাল বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শুরু হল। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ, প্রায় আট থেকে আশির কোঠায় — কেরালা-ঝাড়খণ্ড-হরিপুর-ভূপাল-দিল্লি-চেন্নাই-গোয়া-কর্নাটকের সাথিরা সবাই শামিল সেই পরিক্রমায়। এদের মধ্যে উপকূলবর্তী ও মৎস্যজীবী সমাজের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। কারও কারও হাতে ব্যানার। কেরালার বন্ধুদের অংশগ্রহণই সবথেকে বেশি চোখে পড়ার মতো। ঢাক-ঢোলের মতো বাজনা বাজিয়ে তাঁরা গান গাইতে গাইতে চলেছেন। একবার তামিলে, একবার মালয়ালম ভাষায়, একবার হিন্দিতে কী অপূর্ব সেই সমবেত গান —

হাওয়া চল্ সাগর ভী চল্ এক বাদল লে আয়ে,
আজ সাজানে ইন্দ্রধনুস কো ঘন বাদল লে আয়ে ...

মাঝেমাঝেই পাড়ার বিভিন্ন মোড়ে দাঁড়িয়ে শ্লোগান-গান আর তার তালে তালে নাচ হচ্ছিল, বাচ্চা ছেলে-মেয়ে এবং বয়স্করাও অনেকে নাচছিল পরস্পরের হাত ধরে, মেয়েদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ ছিল নজরকাড়া। প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা ধরে গোটা গ্রাম পরিক্রমা শেষে আবার যখন গির্জার সামনে হাজির হলাম, সেখানে নারকেল পাতার ছাউনির নিচে তখন আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে। মেয়েরা অনেকে ওখানে বালির ওপর বসে বিড়ি বাঁধছে। দুপুর ও রাতের খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাদিন ধরেই অনুষ্ঠান চলল। সন্ধ্যাবেলায় ছিল মূলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান — নাচ-গান-মূকাভিনয় প্রভৃতি।

কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন এবং ইডিনথাকারাই

যে দু-তিনদিন ওখানে ছিলাম নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম কীভাবে একটা গোটা গ্রাম এই আন্দোলনে এমনভাবে শামিল হয়ে গেল, আর আমাদের এখানে বড়ো মিডিয়ায় যে প্রচার বেশ জোরদার ছিল যে 'বাইরের টাকায় (বিদেশি মদতে) এই লড়াই চলছে' সেটাই বা কতটা সত্যি? আমরা যাদের ঘরে ছিলাম, সেই শশী এবং তার মামার কাছেও অনেকটা জানা গেছে।

পরমাণু শক্তির বিপদ নিয়ে এই গ্রামের লোকজন অনেকদিন পর্যন্ত বেশ নির্লিপ্ত-উদাসীন ছিল। ১৯৮৮ সালে যখন এই প্রকল্প নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয় স্থানীয় মানুষকে চাকরি-বাকরি আর অনেক লোভ দেখানো হয়েছিল। প্রথমে এই প্রজেক্ট হওয়ার কথা ছিল কেরালায়। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের তাতে প্রবল বিরোধিতা ছিল। আর তামিলনাড়ুর মানুষ পরমাণু-প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাই কেরালা থেকে সরে এসে প্ল্যান্টের স্থান নির্বাচন করা হল তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রাম কুডানকুলামে। সে সময় রেভারেন্ড ওয়াই ডেভিডের নেতৃত্বে কিছুটা প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ১ মে কন্যাকুমারিতে মৎস্যজীবীদের পদযাত্রার ওপর গুলি চলে, ছয়জন মৎস্যজীবী আহত হয়।

জাপানের ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর সমস্ত গ্রামের চোখ খুলে গেল। মানুষ টিভিতে দেখল পরমাণু চুল্লির ভয়াবহতা। তারপর ২০১১ সালের আগস্ট মাসে কুডানকুলাম কর্তৃপক্ষ যখন 'মক ড্রিল' (নিরাপত্তা মহড়া) করল, গোটা গ্রাম ভয় পেয়ে গেল। শশীকলা যেমন বলছিল, 'প্ল্যান্ট থেকে সাইরেন বাজিয়ে দেওয়া হল। চারিদিক কাঁপতে শুরু করল। ... সেইদিনই ২৩ জন মেয়ের গর্ভপাত হয়। ...'

এবার শুরু হল গণআন্দোলন। ১১ আগস্ট গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে হাজার হাজার গ্রামবাসী জড়ো হল গির্জার সামনে। উদয়কুমার, পুষ্পরায়ন এবং পিপল্‌স মুভমেন্ট এগেনস্ট নিউক্লিয়ার এনার্জির নেতা-কর্মীদের ডাক পড়ল সেখানে। সেদিন থেকে ইডিনথাকারাইয়ের মৎস্যজীবী সমাজ, বিশেষত ঘরের মেয়েরা, হয়ে উঠল এই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং নেতা। বাইরের বুদ্ধিজীবী কর্মীরা তাদের সহযোগী।

শশীর কাছে জানলাম, এই আন্দোলনের তহবিলে প্রত্যেক পরিবার সপ্তাহে ২০০ টাকা করে জমা দেয়। যারা গ্রামের বাইরে বা বিদেশে থেকে রোজগার করে তারা তিনমাস অন্তর একটা মোটা টাকা পাঠায়। ৫০০ দিন অনশন ও অবস্থান চলাকালীন প্রতিদিন কমপক্ষে ২০টা পরিবার সেখানে হাজির থাকে। শশী যায় প্রত্যেক শুক্রবার। আর জেভিয়ার আম্মা, মেলরিটের মতো বেশ কিছু কর্মী তো চোদ্দোমাস যাবৎ দিনরাত সেখানে পড়ে রয়েছেন।

৩১ ডিসেম্বরের সভা

সকালে গ্রাম পরিক্রমার পর সভামঞ্চে উঠে প্রথমেই সবথেকে জোরালো বক্তৃতা দেন মৎস্যজীবী পরিবারের মহিলা মেরি পিটার। অত্যন্ত নিরীহ শান্ত রোগা চেহারা, কিন্তু গলায় আর বক্তব্যে কী জোর! বললেন, পুরুষদের যদি বাইরে কাজে যেতে হয় তারা যাক, মহিলারাই এই প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে সমবেত জনতা তাঁকে সমর্থন জানালো, যার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। একে একে মঞ্চে উঠে কখনো গান গেয়ে, কখনো বক্তৃতা দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা সংগঠন-কর্মী ও ব্যক্তিবর্গ তাঁদের নিজের নিজের আন্দোলনের কথা এবং কুডানকুলাম আন্দোলনের প্রতি সহমর্মীতার কথা জানালেন। যেমন, ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার নিয়ে যারা লড়াই করছে সেই 'জোহার' সংগঠন, ভূপাল গ্যাস পীড়িতদের সংগঠন, মধ্যপ্রদেশের ইন্দিরা সাগর ড্যামের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সাথিরা, এনএপিএম কর্নাটক শাখার প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, মৎস্যজীবীদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম'-এর নেতা, এমন অনেকে। সভা চলাকালীন কেরালা থেকে আরও কিছু মানুষ শ্লোগান দিতে দিতে এসে যোগ দিলেন। তার মধ্যে একজন সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েই হাজির হয়েছেন। কিছু আইনজীবী এবং অন্য বুদ্ধিজীবীরাও বক্তব্য রাখলেন। তাঁদের সব কথা এই পরিসরে জানানো যাবে না, তবে নানা দিক থেকে যে মানুষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তেমন অনেক কিছু জেনে সমৃদ্ধ হলাম। যারা যে ভাষায় বক্তব্য রাখছিলেন সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ইংরেজি-হিন্দি বা স্থানীয় ভাষায় তরজমা করে দেওয়া হচ্ছিল। আর এই সভা পরিচালনার কাজে আন্দোলনের নেতা পুষ্পরায়ন বা উদয়কুমারকে মঞ্চে উঠতে দেখলাম না, সেই কাজ অত্যন্ত দক্ষভাবে চালাচ্ছিল ভার্গবী এবং তার মতোই তরুণ প্রজন্মের কয়েকজন মিলে। অন্য রাজ্য থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে আসা দুটি বাচ্চা মেয়ে গেয়ে উঠল, 'হাম হোঙ্গে কামিয়াব একদিন'।

দুপুরের বিরতিতে খাওয়ার হলে গিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। সেরকম একজন সিস্টার ক্ল্যারিবেল, তিরুনেলভেলি জেলার ইউবারি গ্রাম থেকে এসেছেন। তিনি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। আমাদের বললেন, 'আপনারা এখানে সমুদ্রের জলের রঙ দেখেছেন? কীরকম ঘোলাটে লাল জল? এখানে আশপাশে বেশ কয়েকটা কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে বালি থেকে একটা আকরিক নিষ্কাশনের কাজ চালাচ্ছে। কন্যাকুমারি থেকে শুরু করে টানা সমুদ্রতট জুড়ে এই কাণ্ড চলছে। সেই আকরিক ফ্যাকট্রিতে শোধন করা হচ্ছে আর সমস্ত দূষিত জল গিয়ে মিশছে সমুদ্রে। বর্জ্য বালি যখন এনে ফেলা হয় সমুদ্রতটে, তার ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এখানকার পরিবেশের পক্ষে এটা ভয়ানক ক্ষতিকর। জানেন, মানাবালাকুর্চি নামে একটা গ্রাম ক্যানসার আক্রান্ত মানুষে ভর্তি। ...' সত্যিই আমাদের আধুনিক জীবন সমুদ্রের জল, বালি, মাটি কোনো কিছুকেই রেহাই দিচ্ছে না।

সন্ধ্যাবেলার অনুষ্ঠান

সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে তখন শয়ে শয়ে লোক। প্রথমেই স্থানীয় বাচ্চাদের সমবেত নাচ, গান — বাজনার তালে তালে। মাত্র দুদিনের রিহার্সালে বাচ্চারা এত সুন্দর অনুষ্ঠান করল যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর বিভিন্ন প্রদেশের নাচ-গান, গোয়ার মেয়ে আন্দ্রিয়া আর স্টেফির যৌথ কোরিওগ্রাফ এবং সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল আমাদের কলকাতার ছেলে সুশান্ত দাসের মূকাভিনয়। একটি মাছের চোখ দিয়ে কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্প, সেখানকার আন্দোলন, নিপীড়ন, রাজনীতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল সেই নাটকে। মৎস্যজীবী পরিবারের বাচ্চা-বুড়ো-মহিলা সকলেই দিব্যি বুঝতে পারল সেই নাটক। প্রচুর হাততালি পেল সুশান্ত।

রাত সাড়ে এগারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিরতি। সেই সময়ে গির্জার অনুষ্ঠান — মধ্যরাত্রির প্রার্থনা (midnight mass) চলল, গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে সাদা পোশাকে এসে অনেকেই গির্জার সেই প্রার্থনায় যোগ দিল। আর বাইরের ছাউনির নিচে সবাই তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে, বাচ্চারা অনেকেই দেখি কিছুটা ঘুমিয়ে নিল। তারই মধ্যে কয়েকজন হতদরিদ্র চেহারার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখলাম বালির ওপরে বসে সেই প্রার্থনাসংগীতে গলা মেলালেন, প্রার্থনা করলেন। একটা অদ্ভুত ভাবগম্ভীর পরিবেশ। রাত দেড়টার সময় আবার সবাই সজাগ হয়ে উঠল, একজায়গায় জড়ো হয়ে গেল। বাচ্চারা আমাদের সবার হাতে একটা করে কাগজের কাপ আর মোমবাতি ধরিয়ে দিল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি কাপে এবার চা বা কফি দেবে। তারপর দেখি সবাই মোমবাতি জ্বালিয়ে সেই কাপের মধ্যে ফুটো করে এমনভাবে ধরছে যাতে হাওয়ায় বাতিটা নিভে না যায়। কেউ কেউ মশাল জ্বালিয়ে নিল। এবার সমস্ত গ্রামের মানুষ এবং বাইরের অতিথিরা মোমবাতি আর মশাল হাতে নানারকম শ্লোগান দিতে দিতে একসঙ্গে গ্রাম পরিক্রমা করে উপস্থিত হল সমুদ্রের তীরে। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। গভীর রাতে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন আর তাকে ছাপিয়ে সমবেত জনতার ঐকতান। প্রথমে তামিলে তারপর হিন্দিতে নতুন বছরের জন্য শপথ নেওয়া হল : আমাদের বেঁচে থাকার শপথ, ধরিত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার শপথ। দেশের এক এক প্রান্তে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা, ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন — কুডানকুলামে পরমাণু, গোয়ায় মাইনিং, ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী জীবন, ভূপালে গ্যাসপীড়িত মানুষের লড়াই, মধ্যপ্রদেশে বড়ো বাঁধ — সব যেন একসূত্রে গাঁথা, সমগ্ররূপে মাতৃস্বরূপা বসুন্ধরা আজ বিপন্ন, আমরা সকলেই সেই বিপদ থেকে মুক্তির প্রত্যাশী।

গভীর রাতে আমরা অনেকে ঘরে ফিরে এলাম, আবার অনেকেই সমুদ্রের ধারে থেকে গেল, নতুন বছরের সূর্যোদয়কে স্বাগত জানাতে।

ভোজপুরী রামলীলায় (২)

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা •

ছোটেলাল মঞ্চের সামনে এসে পৌঁছে চারদিক একবার ভালো করে দেখে নিল। জানকীপ্রসাদকে দেখতে না পেয়ে দুপায়ের গোড়ালি দুটি উঁচু করে খুঁজে দেখতে শুরু করতেই, 'আরে ছোটেলাল হাম হেনে বা, হেনে আও' — জানকীপ্রসাদ হাত নেড়ে চীৎকার করে ডাকতেই, দেখতে পেয়ে ছোটেলাল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে এগিয়ে এসে জানকীপ্রসাদের কাছে এসে বসে পড়ে বলল, 'হাম বলে, ক্যা জানে শুরু হো হইলবানি। হামরা পহুচনে দের ভইল। এগো সওয়ারি পহুচাকে, মালিক কো রিক্সা আউর রুপিয়া জমা করকে দৌড়তে দৌড়তে আগইলবানি।' ছোটেলাল ভালো করে গামছা দিয়ে মুখ ও দুহাতের ঘাম মুছে নিয়ে বসতেই জানকীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'কুছ খাকে আইলেবানু।' ছোটেলাল বলল, 'নেইয়ে, সময় কাঁহা মিললেবারো। আব রাতিয়া খাইবোকরি, ফো-চার ঘনতা কা বাতবা ফিলহাল রামলীলা দেখলেবানি। যাতে ওয়াক্ত কাহীভি কুছ হোটেলুয়াবা, উসি হোটেলুয়ামে কিসি হোটেলমে সবজি রোটি দহি নেহিতে। রোটি খা লেলেবানি।' — 'ছোড় দে উসব, আজ তু হামার হেনে খা লেনেবানি। হাম তোরে খাতির জাদা সবজি, রোটি বানাকে রাখলেবানি।'

জানকীপ্রসাদ ইউনিয়ন জুটমিলের দারোয়ান। জুটমিল-অ্যাসফাল্টম কারখানার সামনে, কলকাতা পুরসভার ধাপায় রেলওয়ে লাইনের মাঝখানে একপ্রস্থ লম্বা লম্বা ঘাসহীন মাঠের মতো জমিতে এই রামলীলা হচ্ছে। এই ঘাসহীন জমিতে বাঁশ, ত্রিপল দিয়ে ঘিরে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চের সামনে শামিয়ানা টাঙানো পুরসভার রেলওয়ে লাইনের ধারে ব্রিজের সামনে কলকাতা পুরসভার আলোকস্তম্ভের হ্যালোজেন, মার্কারির আলো। জুটমিল ও অ্যাসফাল্টম কারখানার প্রাচীরের ওপর দিকে কাঁটাতারের বেড়ায় দুটো অ্যাঙ্গেল রডের ভেতরে প্রাচীরের ধারে ল্যাম্প পোস্টের আলোতে এই ঘাসহীন ফাঁকা জমিটা আলোয় আলোকিত হয়ে থাকে। সেই আলো খুব তীব্র না হলেও রাতে দর্শকদের দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। সন্ধ্যের পর কলকাতা পুরসভার রেল কাঠের বগিতে জঞ্জাল নিয়ে ধাপায় যাওয়া বন্ধ থাকে। শুধু ব্রিজের ওপর মানুষের যাতায়াত ও যানবাহন চলাচল ছাড়া পুরো এলাকাটা একরকম শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এই রামলীলা চলাকালীন দর্শকরা অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য্য হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠার মতো হয়। অস্থির হয়ে উঠছে, এমন সময় শোনা গেল, — 'প্রভু রামজী কা সন্দেশ লেকর জানকী পাস চলে মহাবীর হনুমান।' দু-দিক থেকে হাত দিয়ে টেনে মঞ্চের পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল। মঞ্চে ঢোল, সারেঙ্গী, বাঁশি, মন্দিরা, খঞ্জনী, জগঝম্প নিয়ে বসে বাজিয়ের দল গানের সাথে বাদ্য সঙ্গত করে। মঞ্চের ডানদিক থেকে গদা কাঁধে নিয়ে হনুমান প্রবেশ করল। মঞ্চের ডান ও বামদিকে কাঠের বাটাম দিয়ে তৈরি করা ফ্রেমে মেরিন ব্লু কাপড় লাগিয়ে, মঞ্চের ডান ও বাম দুদিকে তিনটি করে কাঠের বাটামের তৈরি ফ্রেম দাঁড় করিয়ে ছ-টি উইংস তৈরি করা হয়েছে। সাজঘরের সামনে ডান-বাঁদিকের উইংস দুটো মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য। বাকি দুদিকে দুটো উইংসের ধারে বাজিয়েরা বসে আছে। চিত্রকূট থেকে হনুমান অশোক কাননে এসে পৌঁছল। অশোক কাননে পৌঁছে চারদিকে উঁকি মেরে ভালো করে দেখে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে রাবণের প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দিনী সীতার কাছে যাবার জন্য এগোতে শুরু করল। এই দৃশ্য দিয়ে আজকের রামলীলার পালা শুরু হল। পালা চলতে চলতে রাত বেড়ে যায়, অনেক রাতে শেষ হয় পালা প্রতিদিন। গ্রীষ্মের রাতে মুক্ত আকাশের নিচে, মুক্ত প্রান্তরে এভাবে রামলীলা চলে।

খ ব রে দু নি য়া

মায়ানমারে চীনা খনির পক্ষে ওকালতি করে জনবিক্ষোভের মুখে সু কি

কুশল বসু, কলকাতা, ১৪ মার্চ • মায়ানমারে খনিজ দ্রব্যের দখলদারি ভাগ-বাঁটোয়ারাতে সামিল হয়েছে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং আমেরিকা। দেশটির উত্তর পশ্চিম দিকে মনিয়া শহরের কাছে চীনা কর্পোরেটের ৫০ হাজার কোটি টাকার তামার খনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে স্থানীয় মানুষ। বেধড়ক ঠ্যাঙানিও খেয়েছে পুলিশের হাতে।

এই লেটপাটং তাম্রখনির যৌক্তিকতা ও পুলিশি অত্যাচার নিয়ে সম্প্রতি একটি তদন্ত কমিশন বসেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন মায়ানমারের গণতন্ত্রকামী নেত্রী আঙ সান সু কি। তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, বিদেশের কাছে দেশের মান বাঁচাতে একটু ত্যাগ স্বীকার করেও তাম্রখনি প্রকল্পটি হওয়া দরকার। সেই রিপোর্ট নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়েন সু কি। সঙ্গের এপি-র ছবিতে ১৩ মার্চ গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

মহিলা লাইব্রেরি দখল করে মহিলা দিবস উদ্‌যাপন

সূত্র : ইন্টারঅকুপাই.নেট • ১০ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে সত্তর জন মহিলা চুপিচুপি জড়ো হয়ে বেলা দেড়টার সময় লন্ডনের ২৫নং ওল্ড ক্যাসেল স্ট্রিটে উইমেনস লাইব্রেরির দখল নিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই আরও বহু প্রতিবাদী মানুষ সেখানে জড়ো হয়ে গেল। ব্রিটেনের সরকার তাদের কাটছাঁটের কর্মসূচিতে এই লাইব্রেরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই বিরুদ্ধে সেদিনের জমায়েত। গতবছর সরকার এই কাটছাঁটের কর্মসূচি অনুযায়ী প্রায় ত্রিশ হাজার মহিলাকে স্থানাভাবে আশ্রয়শিবির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

উইমেনস লাইব্রেরি হল মেয়েদের ইতিহাস সংক্রান্ত পৃথিবী বিখ্যাত সংগ্রহের কেন্দ্র। মেয়েদের সমানাধিকার নিয়ে এখানে একটা সংগ্রহশালা রয়েছে। স্থানীয় এক মা জেন সামার্স বলেন, 'দুর্বল শ্রেণীর মানুষের ওপর সরকারের আঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেয়েরা। আমাদের সমাজের বুকে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো এই কাটছাঁটে আক্রান্ত হয়েছে। বেপরোয়াভাবে মেয়েদের আশ্রয়শিবির এবং পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রে পরিষেবা বন্ধ করে এরা আমাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ... ইতিহাসের এমন এক মুহূর্তে উইমেনস লাইব্রেরি দখল করে আমরা বোঝাতে চাই 'কথার চেয়ে কাজ করা' এখন জরুরি।'

বড়তলায় আকুপাংচার চিকিৎসা চলছে

১০ মার্চ, নিজামউদ্দিন আহমেদ, হাজিরতন, মেটিয়াব্রুজ • মানবতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শকে সঙ্গী করে ডাঃ দারকানাথ কোটেনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি গত ৩৯ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি সংগঠনের বড়তলা শাখার ৩৯তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মেটিয়াব্রুজ সেবা সদনে। এই সংগঠন প্রধানত আকুপাংচার চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ালেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও কাজ করে চলেছে। যদিও বড়তলা শাখায় কর্মীর অভাবে শুধুমাত্র আকুপাংচার চিকিৎসাটাই করা হয়। সম্পাদক হিসেবে আমি বার্ষিক খসড়া রিপোর্ট পেশ করলে সদস্যরা তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেটি গৃহীত হয়। এই শাখা ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২১১৮৮ জন রোগীর আকুপাংচার চিকিৎসা করেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ।

সম্মেলন থেকে আগামী বছরের পদাধিকারীদের বেছে নেওয়া হয়, যথাক্রমে, সভাপতি সত্যব্রত চ্যাটার্জি, সহ সভাপতি শেখ সাহনাওয়াজ, সম্পাদক নিজামউদ্দিন আহমেদ, সহ সম্পাদক মহঃ মোরতাজা মোল্লা, সদস্য ডাঃ দাউদ আনসারি, ফরিদউদ্দিন মোল্লা ও সফিউদ্দিন মোল্লা।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.